ইতিহাসের পাতা থেকে...

প্রাচীন ভারতে গোমাংস

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

অধিকাংশ স্বদেশবাসীর কাছেই, আমি জানি, এই প্রবন্ধের শিরোনাম অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকবে। তবুও হিমালয়ের এপারে আর্যজাতির আদি সামাজিক ইতিহাসের অনুসন্ধানের কৈফিয়ত হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে বলে আমার বিশ্বাস। খাদ্য হিসেবে গোমাংস– যা কিনা দেবী ভগবতীর পার্থিব প্রতিনিধির মাংস– স্রেফ এই চিন্তাটাই হিন্দুদের কাছে এত ঘৃণ্য যে তাঁদের মধ্যে যাঁরা একটু গোঁড়া এরকম হাজার হাজার মানুষ শব্দটাই উচ্চারণ করেন না, গোহত্যার জন্য শোচনীয় রক্তক্ষয়ী দাঙ্গাও এদেশে বড় কম হয়নি। অথচ একটা সময় ছিল যখন গোহত্যার জন্য মানুষের মনে বিবেকদংশন হওয়া দূরে থাক, গোমাংস পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে গৃহীত হতো। সেকালে প্রাচীন ইহুদীদের মতো সম্মানিত অতিথির খাতিরে হৃষ্টপুষ্ট বাছুর মারা তো উদার আতিথেয়তা হিসেবে গণ্য হতোই, হিন্দুদের পরলোকযাত্রাতেও গোমাংস অবশ্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ছিল– মৃতের সঙ্গে সবসময় দাহ করা হতো একটি গরুও। যেসব ইংরেজ আজকের দিনে এ ব্যাপারে দেশের মানুষের আবেগের সাথে পরিচিত, তাঁরাও যেমন এ তথ্যে বিস্মিত হবেন, ততটাই আশ্চর্য হবেন এদেশীয় অনেকেই। কিন্তু, যেসব সূত্র থেকে এ তথ্যের আহরণ, সেগুলি এতই প্রামাণিক ও আকাট্য যে এক মুহূর্তের জন্য অস্বীকার করা যায় না।

শিক্ষিত স্বদেশবাসীদের কাছে এ কথা অজানা নয় যে, বেদের নির্দেশে এক সময় গোমেধ নামে এক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু তাঁদের অনুমান, তা ছিল নিছক রূপকানুষ্ঠান, সত্যিসত্যিই গরু বলি হতো না। এরকম ব্যাখ্যায় গোটা ব্যাপারটাকে রহস্যে মুড়ে রাখেন তাঁরা। যাঁরা এ বিষয়ে অদীক্ষিত তাঁদের কাছে তা হয়ে উঠে দূর্বোধ্য, কিংবা তাঁরা বোঝেন এমনভাবে যে সত্য থেকে অনেক দূরে সরে চলে যান। যখন এ ব্যাপারে অধ্যাপক উইলসনের নজর পড়ে, সে সময়ে এই ধাঁধাঁবাজি এতটাই হয় যে তিনিও দোলাচলে পড়ে যান, যদিও তাঁর মতো পণ্ডিত ও সমালোচকের কাছ থেকে সত্যকে পুরোপুরি আড়াল করা সম্ভব হয়নি। 'মেঘদূতে'র অনুবাদের একটি টীকায় অধ্যাপক উইলসন বলেন, 'গোমেধ বা অশ্বমেধ, প্রাচীনতম হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের মামুলি অঙ্গ ছিল। ভাবা হয় যে বলিদান বাস্তবে হতো না, তা রূপক মাত্র; উৎসর্গিত প্রাণীটির কল্পবলিদানের পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হতো। এই অংশের পাঠ থেকে কিন্তু এই ধারণার সমর্থন মেলে না, কেননা গাভীকুলের রক্তের নদীতে রূপান্তর রক্তের ব্যপ্তিকেই নির্দেশ করে।....'

বিদ্বান অধ্যাপকের এই যুক্তি কিন্তু এদেশের লোকের মাথায় অনেকদিন আগেই এসেছিল এবং কেউ কেউ এমনও বলেছিলেন যে, রক্তের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে বলির রূপকটিকে সম্পূর্ণ করার জন্যে। অন্যেরা যাঁরা প্রাচীন পুঁথির ভাষা সরলভাবে মেনে নিতেই অভ্যস্ত, আবার একই সঙ্গে বেশি সাহসীও, ধরে নেন যে বলিপ্রদত্ত প্রাণীগুলি অনিবার্যভাবে প্রাণ ফিরে পেত সঙ্গে সঙ্গেই, বলিদাতার অলৌকিক শক্তির কল্যাণে।

এই প্রস্তাব সমাজের নিচুতলার ধর্মভীরু মানুষের কাছে যথেষ্ট হলেও তা যুক্তির সীমানার এত দূরে যে এটি সচ্ছন্দে পরিহার করতে পারি। কিন্তু নিষ্ঠাবান হিন্দু এ প্রশ্ন করতেই পারেন যে, তাহলে কেন প্রাচীন কবি ঋষি বাল্মীকি তাঁর ভাই মুনি বশিষ্ঠকে অভ্যর্থনা জানাতে মারলেন অনেকগুলি বাছুর শুধু অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্যে, বিশেষত যেখানে বশিষ্ঠ নিজে একজন স্মৃতিকার এবং বেদের এক প্রধান চরিত্র? এক্ষেত্রে তবে পশুগুলির পুনর্জীবনদান হতে পারে শুধু তাদের মাংস খাওয়ার পরেই। বাল্মীকির বশিষ্ঠকে অভ্যর্থনার এই লক্ষণীয় বিবরণটি আছে 'উত্তররামচরিতে'। .....

আবার বশিষ্ঠকে বাছুর বলি দিতে দেখি বিশ্বামিত্র, জনক, শতানন্দ, জামদগ্ন এবং অন্যান্য ঋষি ও বন্ধুদের আপ্যায়নের সময়ে। 'মহাবীরচরিতে' জামদগ্ন্যকে শান্ত করতে তিনি প্রলোভন দিচ্ছেন, 'বাছুরটি বলির জন্যে প্রস্তুত, ঘি দিয়ে তৈরি হয়েছে খাদ্য। আপনি শ্রোত্রিয় (পণ্ডিত), পণ্ডিতের বাড়িতে আসুন, আমাদের অনুগ্রহ করুন (উৎসবে যোগ দিয়ে)।'

এই সমস্ত উদাহরণই উদ্ধৃত হয়েছে নানা কাল্পনিক কাহিনী থেকে। কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে যে এসব কাহিনীর লেখকেরা নিশ্চয়ই এমন কোন বিষয়ের অবতারণা করেন নি যা তাদের পাঠকদের মনে বিরূপ

অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারত।

কোলব্রুক তাঁর 'হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান' সম্পর্কিত প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে লেখেন, 'মনে হয় প্রাচীন যুগে এই উপলক্ষ্যে (অতিথি আপ্যায়নের সময়) গোবধের রীতি ছিল এবং সেজন্যে অতিথিকে বলা হত গোঘ্ন বা গোহত্যাকারী।.....'

মনু নির্দেশ দিয়েছেন, যে কোন সময়েই পশুমাংস খাওয়া যেতে পারে, তবে প্রথমে তার কিছু অংশ দেবতা, পূর্বপুরুষের আত্মা অথবা অতিথিকে অর্পণ করতে হবে। তিনি বলেছেন, পশুমাংস কিনে অথবা অন্যের সাহায্যে সংগ্রহ করে দেবতা বা পূর্বপুরুষের পুজার পরে যিনি গ্রহণ করেন, তিনি কোন রকম অধর্ম করেন না (৫/৩২)....'। কিন্তু মনু খাদ্যের মধ্যে কোথাও গোমাংসের সরাসরি উল্লেখ করেন নি। মানুষের খাদ্যের উপযুক্ত প্রাণীর তালিকায় অবশ্য তিনি লেখেন 'পাঁচ আঙ্গুলবিশিষ্ট প্রাণীদের মধ্যে কাঁটাচুয়া অথবা সজারু, গোধ বা গোসাপ, গণ্ডক (গণ্ডার), কাছিম, শশক বা খরগোসকেই জ্ঞানী আইনপ্রণেতারা বৈধ খাদ্য বলেছেন আর বলেছেন উট ছাড়া যাবতীয় চতুষ্পদকে, যাদের যাদের একসারি দাঁত রয়েছে' (৫/১৮)। এর মধ্যে অবশ্যই গরু পড়ে, কেননা তিনি ভালভাবেই জানতেন যে গরুর দাঁত একসারি। যদি তাঁর তালিকা থেকে গরুকে বাদ দেওয়ার ইচ্ছেই থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই উটের সঙ্গে তারও উল্লেখ করতেন। অবশ্য এভাবে তাঁর অভিপ্রেত বক্তব্য অনুমান করে যুক্তি খাঁড়া করার দরকার নেই। ব্রহ্মচারীর ঘরে ফেরার পরে গোমাংসের ব্যবহার সম্পর্কে তিনি পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, 'কঠোরভাবে কর্তব্য পালনের জন্যে যথাযথভাবে অভিনন্দিত হয়ে এবং তার জন্মদাতা বা পিতৃসম শিক্ষকের কাছ থেকে বেদের পূণ্যজ্ঞানলাভের পরে তাকে পুষ্পশোভিত সুন্দর শয্যায় নিয়ে যাও। সেখানে তার পিতা তার বিবাহের **মধুপর্ক** আচার অনুসারে একটি গরু উপহার দিয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করবেন (৩/৩)। পরবর্তী অধ্যায়ে তিনি রাজা ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আপ্যায়নে **মধুপর্ক** অর্থাৎ গোমাংসসহ মধুমিশ্রিত খাদ্য দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন (৩/১১৯-২০)।

'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে'ও গোমেধের উল্লেখ আছে; কিন্তু কোন বিশদ বর্ণনা নেই অথবা খাদ্য হিসেবে গোমাংস ব্যবহারের কথাও পরিষ্কার করে বলা নেই।

প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র কিন্তু এ ব্যাপারে অনেক বেশি স্পষ্ট। খ্রীস্টপূর্ব ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতকে 'চরকসংহিতা'র খাদ্য সম্পর্কিত অধ্যায়ের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, 'গরু, মহিষ বা শুয়োরের মাংস প্রত্যেকদিন খাওয়া অনুচিত।' এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, খাদ্য হিসেবে এদের চল ছিল, কিন্তু মাছ, দই আর যবের পিঠের মতোই, দুষ্পাচ্য হওয়ার জন্যে প্রাত্যহিক ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে। অন্যত্র ভ্রূণ শক্তিশালী করবার জন্যে 'চরকসংহিতা'র লেখক গর্ভবতী মায়েদের গোমাংস খাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। যেসব রোগে গোমাংস নিষিদ্ধ, সুশ্রুত তার বইয়ের খাদ্য সংক্রান্ত অংশে তাদের উল্লেখ করেছেন। আদিযুগে চিকিৎসা সংক্রান্ত অন্য অনেক বইতেও একই নির্দেশ দেখা যায়। কোথাও কঠোরভাবে বর্জনের কথা আদৌ চোখে পড়ে না। মধ্যযুগের কিছু বইতে খিঁচুনি ও মূর্ছার আক্রমণ কাটিয়ে উঠার সময় রোগীদের গোমাংসের সুরুয়া খেতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

কল্প ও গৃহ্যসূত্রে, এমনকি বেদেও, এ সম্বন্ধে আরও অনেক বিশদ আলোচনা দেখা যায়। এগুলিতে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, গোমাংস খাদ্য হিসেবে প্রচলিত ছিল। কোন্ কোন্ উপলক্ষ্যে গোহত্যা করতে হবে এবং গোমাংস খেতে হবে তারও দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। গোভিল শ্রাদ্ধে গোমাংস ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন।

বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের মূল্যবান আকরগ্রন্থ কৃষ্ণর্জুবেদ ব্রাহ্মণ (যেখানে প্রাচীন ভারতের ধর্মজীবনের সবচেয়ে গভীর পরিচয় মেলে)- এ এমন অসংখ্য অনুষ্ঠানের উল্লেখ রয়েছে যেগুলিতে গোমাংস দরকার হতো। শুধু তা-ই নয়, কোন্ দেবতার তুষ্টির জন্য কী ধরনের গরু বলি দিতে হবে, তারও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা রয়েছে এতে, কাম্য ইষ্টি অর্থাৎ বিশেষ প্রার্থনা সহযোগে গৌণ যজ্ঞের মধ্যে বিষ্ণুর উদ্দেশে দিতে হবে একটি বামন বলীবর্দ .... পূষণের উদ্দেশে একটি কালো গাই .... রুদ্রের উদ্দেশে একটি লাল গাই .... ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানেই দেখা যায় যে, অশ্বমেধের একটি নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত পশুর গোত্র, বর্ণ, বয়স ইত্যাদি বিভিন্ন হতে হবে।

রাজসূয়, বাজপেয়, অশ্বমেধ এইসব বড় বড় যজ্ঞের সঙ্গে গোবধ অপরিহার্য ছিল। **গোসব** প্রথম দুটির অনিবার্য অঙ্গ ছিল এবং এতে যজমানের এ পৃথিবীতে যেমন সম্পূর্ণ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার, তেমনি ব্রহ্মলোকেও অরণ্যে গরুটির মতো স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিশ্রুতি থাকত।

'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে' অশ্বমেধের বিবরণে ঘোড়া, ষাঁড়, গরু, ছাগল, হরিণ, নীলগাই ইত্যাদি ১৮০ রকমের পোষা প্রাণী পোষার নির্দেশ আছে।.....

এই 'ব্রাহ্মণে' আরেকটি বড় অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে, যাতে মরুৎদের সন্তুষ্টি ও তাঁদের উপাসকদের মনোরঞ্জনের জন্যে অনেক গরু অগ্নিসাৎ করা হতো। একে বলা হতো **পঞ্চশারদীয় সব**। আধুনিক হিন্দুদের কাছে দুর্গাপূজার যে গুরুত্ব, প্রাচীন ভারতে এই অনুষ্ঠান সেরকমই মর্যাদা পেত। নাম থেকেই অনুমান করা যায় যে, পরপর পাঁচ বছর ধরে এই উৎসব হতো, প্রত্যেকবারেই পাঁচদিন ধরে। আরম্ভ হতো বিশাখা রাশির অমাবশ্যায়, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে।

এই উৎসবের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান ছিল সতেরোটি করে পাঁচ বছর বয়সী বামন কুঁজবিহীন ষাঁড় ও তিন বছরের কমবয়সী বামন বলদ। ষাঁড়গুলিকে উৎসর্গ করার পর ছেড়ে দেওয়া হতো। বলদগুলি বলি হতো উপযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের পরে। প্রত্যেকদিন হতো তিনটি করে বলি। শেষদিনে সে বছরের মতো উৎসবের সমাপ্তি উদ্‌যাপন করতে বলি দেওয়া হতো অতিরিক্ত দুটি পশু। সামবেদের 'তাণ্ড্যব্রাহ্মণে'ও এই উৎসবের উল্লেখ আছে। শুধু তাতে পরপর দুবছর দুটি আলাদা রঙের গরু বলি দিতে বলা হয়েছে। ....বেদের একটি কাহিনী অনুসারে এ যজ্ঞ প্রথম করেন প্রজাপতি। একসময়ে তাঁর ধন ও পরিজনে সমৃদ্ধিলাভের বাসনা জাগল। 'তিনি পঞ্চশারদীয় দেখতে পেলেন এবং সে দিয়ে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে ধন ও পরিজনে সমৃদ্ধিলাভ করলেন।' 'যিনি মহত্ব পেতে চান, তিনি পঞ্চশারদীয় মতে অর্চনা করুন, তাহলে অবশ্যই মহত্ত্বলাভ করবেন।' অন্যত্র বলা হয়েছে যে, এই অনুষ্ঠানের ফলে সম্পূর্ণ স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা হয় ঋষি কান্দমের কথা।

'আশ্বলায়ন সূত্রে' এমন অনেক যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে যাদের অন্যতম অঙ্গ ছিল গোহত্যা। তাদের মধ্যে 'গৃহ্যসূত্রে' বর্ণিত একটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এর নাম ছিল **শূলগব**, শূলপক্ব গোমাংস। ...

যিনি এই কৃত্যটি সম্পন্ন করতেন তিনি দীর্ঘ জীবন এবং অতুল ধন, মান, সন্তান-পরিজন ও পূণ্যের অধিকারী হওয়ার নিশ্চয়তা পেতেন। প্রত্যেক গৃহস্থকে জীবনে অন্তত একবার এটি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ...

এর পরে যে বিবরণ আমার চোখে পড়েছে **গবাময়ন** বা গাভী বলি। একে একাষ্টকও বলা হতো, ... এর অনুষ্ঠানবিধির সঙ্গে সাধারণ পশুবন্ধ-র অনেক মিল আছে। মনে হয় এটি মহাপ্লব, দ্বাদশাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের অংশমাত্র ছিল, আলাদা করে পালিত হতো না।

এরকম অন্য অনেক অনুষ্ঠানে গোমাংসের প্রয়োজন হতো। অতিরাত্র অনুষ্ঠানে কাত্যায়ন মরুৎদের উদ্দেশে একটি বন্ধ্যা গাই (বিভিন্ন বর্ণের হলে ভাল হয়) উৎসর্গ করতে বলেছেন আর প্রজাপতির উদ্দেশে বলি দিতে বলেছেন সতেরোটি শিঙের আগা ছেঁটে দেওয়া পূর্ণাঙ্গ কালো ষাঁড়। সঙ্গে সঙ্গে এমনও বলা আছে যে এই তিনটি শর্ত একসঙ্গে পূরণ না হলেও ক্ষতি নেই। একটি বা দুটি লক্ষণ থাকলেই চলবে।....

বিভিন্ন সূত্রকার গরুসহ অন্যান্য পশুবলির ক্ষেত্রে কী কী সাধারণ নিয়ম মানতে হবে তার উল্লেখ করেছেন। ... আশ্বলায়ন এই সমস্ত নিয়মকে 'পশুকল্প' শিরোনামে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই নিয়মগুলি সহজ হলেও গণ্যমান্য অতিথি আপ্যায়নের সময়ে প্রয়োগের পক্ষে যথেষ্ট জটিল। সে জন্যে একগুচ্ছ নিয়ম দেওয়া আছে। এই অনুষ্ঠানের নাম **মধুপর্ক**। ঋত্বিক্, রাজা, পাত্র, শিক্ষান্তে ঘরে ফেরার উপলক্ষ্যে বেদ শিক্ষার্থী এক বছর বাদে ঘরে ফেরার পরে আচার্য বা শিক্ষক, শ্বশুর, পিতৃব্য এবং সাধারণভাবে যে-কোন উচ্চপদাধিকারীর ক্ষেত্রে এ

> প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র কিন্তু এ ব্যাপারে অনেক বেশি স্পষ্ট। খ্রীস্টপূর্ব ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতকে 'চরকসংহিতা'র খাদ্য সম্পর্কিত অধ্যায়ের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, 'গরু, মহিষ বা শুয়োরের মাংস প্রত্যেকদিন খাওয়া অনুচিত।' এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, খাদ্য হিসেবে এদের চল ছিল, কিন্তু মাছ, দই আর যবের পিঠের মতোই, দুষ্পাচ্য হওয়ার জন্যে প্রাত্যহিক ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে। অন্যত্র ভ্রুণ শক্তিশালী করবার জন্যে 'চরকসংহিতা'র লেখক গর্ভবতী মায়েদের গোমাংস খাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। যেসব রোগে গোমাংস নিষিদ্ধ, সুশ্রুত তার বইয়ের খাদ্য সংক্রান্ত অংশে তাদের উল্লেখ করেছেন। আদিযুগে চিকিৎসা সংক্রান্ত অন্য অনেক বইতেও একই নির্দেশ দেখা যায়। কোথাও কঠোরভাবে বর্জনের কথা আদৌ চোখে পড়ে না। মধ্যযুগের কিছু বইতে খিঁচুনি ও মূর্ছার আক্রমণ কাটিয়ে উঠার সময় রোগীদের গোমাংসের সুরুয়া খেতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠান অবশ্য পালনীয় ছিল।

আশ্বলায়ন জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, পশুমাংস ছাড়া **মধুপর্ক** অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। তাকে অনুসরণ করে তাঁর টীকাকার গর্গনারায়ণ বলেন, "যখনই একটি পশুকে উৎসর্গ করা হয় তখন তার মাংসই খাদ্যের প্রয়োজনে লাগে। যদি তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে অন্য যে-কোনভাবে পশুমাংস জোগাড় করতে হবে। কখনোই তা বাদে ভোজ সম্পন্ন হবে না।"

এক্ষেত্রে তিনি মনুর নির্দেশ মতোই চলেছেন। মনু বলেন যে, মানুষ (মধুপর্ক বা অন্য কোনো) উৎসবে পশুমাংস গ্রহণ করেন না, তিনি একুশ জন্ম পশু হয়ে জন্মাবেন। যেহেতু ব্রহ্মা উৎসর্গের উদ্দেশ্যেই প্রাণীর সৃষ্টি করেছেন, সেজন্যে বৈদিক আচারে পশুবলি ক্ষতিকর তো নয়ই, বরঞ্চ পবিত্র যজ্ঞে আহুতির পরে পশু, পাখি, উদ্ভিদ্ ও কাছিম সৃষ্ঠির মানদণ্ডে আরও উপরে ঠাঁই পায়। ...

এখানে উল্লেখ্য যে ব্রহ্মহত্যা, ব্রাহ্মণের সুরাপান, ব্রাহ্মণের স্বর্ণ অপহরণ ও আচার্য্যের শয্যা কলুষিত করা এবং চারটি অপরাধে দোষী ব্যক্তির সঙ্গে একবছর মেলামেশাকে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ ('মহাপাতক')। আর অন্যায় গোহত্যা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে গৌণ অপরাধ বা উপপাতক-এর মধ্যে। তার জন্যে প্রায়শ্চিত্তও যৎসামান্য।

সুরাপানের দায়ে অভিযুক্ত ব্রাহ্মণ গলিত ধাতু পান করে আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কোনোভাবে প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন না, সম্বর্ত একজন গোঘাতকের পনেরো দিন যব, দুধ, দই ও মাখনের স্বল্পাহার, একটি ব্রাহ্মণভোজন ও একটি গোদানের বিধান দিয়েই ছেড়ে দিয়েছেন। যাজ্ঞবল্ক্য অবশ্য একটু বেশি কড়া **: পঞ্চগব্য –** অর্থাৎ পাঁচটি গোজাত পদার্থ –পান, বিনা বাধায় ঘুরে বেড়াচ্ছ এমন একটি গরুর পশ্চাদনুসরণ, পুরো একমাস গোয়ালে নিয়মিত শয়ন ও সবশেষে একটি গোদান বা বিনষ্ট প্রাণীর তুল্যমূল্য অর্থদণ্ড। অন্যভাবে প্রায়শ্চিত্তের কথাও তিনি বলেছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী স্মৃতিকারদেরও নিজের নিজের বিধান রয়েছে; কিন্তু কোন নির্দেশই আত্মহত্যার ধারেকাছেও যায় না।

নরসিংহীয় প্রয়োগপারিজাত'-এর লেখক **মধুপর্ক** অনুষ্ঠানে গোমাংস খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আশ্বলায়নের নিয়ম পুরোটাই উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি 'আদিত্যপুরাণে'র একটি শ্লোকও উল্লেখ করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে, কলিযুগে গোহত্যা ছাড়াই **মধুপর্ক** সম্পাদন করা উচিৎ। ...

'নরসিংহীয় প্রয়োগপারিজাত'-এর লেখক **মধুপর্ক** অনুষ্ঠানে গোমাংস খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অশ্বালায়নের নিয়ম পুরোটাই উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি 'আদিত্যপুরাণে'র একটি শ্লোকও উল্লেখ করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে, কলিযুগে গোহত্যা ছাড়াই **মধুপর্ক** সম্পাদন করা উচিৎ। ...

'বৃহন্নারদীয় পুরাণে'ও একইরকম কথা বলা হয়েছে। ...উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো যে, 'আদিত্যপুরাণে'র আরোপিত বিধিনিষেধ স্পষ্ট ও নিশ্চিতভাবে বলা নেই, বরং তা অনেকটা ইঙ্গিতে বুঝানো হয়েছে : 'যেহেতু কিছু জ্ঞানী বা প্রাজ্ঞ পুরুষ তা করেন নি এবং ধার্মিক মানুষের কৃতকর্ম বেদের মতই অকাট্য প্রমাণ', অতএব তা করা উচিৎ নয়– এটাই বলতে চেয়েছিলেন লেখক, কিন্তু অত কথা তিনি বলেন নি। দুটি ক্ষেত্রেই উৎস হলো উপপুরাণ, যেগুলির বয়স এগারোশ-বারোশ বছরের বেশি নয়। অধ্যাপক উইলসনের মতে, উপপুরাণগুলি দ্বাদশ শতকের আগে লেখা নয়। যখন দেখি যে বল্লাল সেন 'দানসাগরে' 'বৃহন্নারদীয়'কে প্রামাণিক গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তবে তা নিশ্চয়ই তখন থেকে চার কি পাঁচ শতক আগে লেখা হয়ে থাকবে। তা হলেও এগুলি এত অসাবধানে সংরক্ষিত ছিল এবং প্রক্ষিপ্ত অংশ এদের মধ্যে এত বেশি যে সব মিলিয়ে এদের প্রামাণিকতা বেশ সন্দেহজনক। সেজন্যে খুব গোঁড়া হিন্দুও বেদ, স্মৃতি ও সূত্রের তুলনায় এগুলিকে অনেক নিচে স্থান দেন। 'প্রয়োগপারিজাতে' বলা হয়েছে, শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধে শ্রুতিই প্রাধান্য পাবে। আবার স্মৃতির স্থান পুরাণের ওপরে আর স্মৃতির মধ্যে মনু অগ্রগণ্য।

কল্পসূত্রের প্রত্যক্ষ উৎস বেদ। তাই শাস্ত্র হিসেবে তাদের ভারবত্তা স্মৃতির চেয়ে বেশি। সেজন্যে স্মৃতিকার পৌলস্ত্যের মতে মনুকে কল্পসূত্রের কাছে নতি স্বীকার করতেই হবে। কোনো আইনকর্তা বা টীকাকার এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেন নি। উপপুরাণ পুরাণের তুলনায় গৌণ এবং কখনোই তারা পুরাণকে

'নির্ণয়সিন্ধু'র রচয়িতা আরও অগভীর যুক্তি দর্শান। অনামা কোনো সূত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি শুরু করেন, 'যে-কাজ স্বর্গে যাওয়ার পক্ষে উপযুক্ত নয় এবং যা বিরূপ সৃষ্টি করে তা করা অনুচিত।' সুতরাং তাঁর মতে, 'বড় ষাঁড় ও ভেড়া বলি যদিও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের জন্য বিহিত হয়েছে, তবুও তা করা অনুচিত, যেহেতু তা জনসাধারণের কাছে ঘৃণ্য।'

অতিক্রম করার প্রশ্রয় পায় নি, শ্রুতি ও স্মৃতির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। ওপরের আলোচনাসাপেক্ষে গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী তাহলে এভাবে সাজানো যেতে পারে : প্রথম শ্রুতি বা বেদ, দ্বিতীয় সূত্র, তৃতীয় স্মৃতি, চতুর্থ পুরাণ, পঞ্চম উপপুরাণ। সুতরাং লক্ষ্য করার ব্যাপার যে, একমাত্র এক্ষেত্রে শেষেরটি আগের চারটিকে লঙ্ঘন করতে পারল। 'নির্ণয়সিন্ধু'র রচয়িতা আরও অগভীর যুক্তি দর্শান। অনামা কোনো সূত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি শুরু করেন, 'যে-কাজ স্বর্গে যাওয়ার পক্ষে উপযুক্ত নয় এবং যা বিরূপ সৃষ্টি করে তা করা অনুচিত।' সুতরাং তাঁর মতে, 'বড় ষাঁড় ও ভেড়া বলি যদিও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের জন্য বিহিত হয়েছে, তবুও তা করা অনুচিত, যেহেতু তা জনসাধারণের কাছে ঘৃণ্য।'

পুনশ্চ, মিত্র ও বরুণের জন্যে উৎসর্গিত গরু বা বন্ধ্যা গাই বা প্রথম বাছুর প্রসবের পর যে গাই বন্ধ্যা হয়ে গেছে, তাদের বলি যদিও নিয়মসিদ্ধ, তাও করা অনুচিত, কেননা তা জনসাধারণের অনুভূতির পরিপন্থী।

এই যদি ঘটনা হয় তবে প্রশ্ন হলো : বেদের আদেশের বিরুদ্ধে এই অনুভূতি তৈরি হলো কবে থেকে? সবচেয়ে যথাযথ উত্তর পাওয়া যাবে ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে। বৌদ্ধধর্মের জোরালো ও সফল বলিবিরোধিতার মুখে ব্রাহ্মণেরা বুঝতে পারলেন যে, পশুজীবনের প্রতি শ্রদ্ধার নীতি এতই শক্তিশালী ও জনপ্রিয় যে তাকে পরাস্ত করার চেষ্টা বৃথা। তাই ধীরে ধীরে সবার অলক্ষ্যে এমনভাবে এই তত্ত্বকে তাঁরা আত্মসাৎ করলেন যেন তা তাঁদের শাস্ত্রেরই অঙ্গ। প্রাণজ সৃষ্টির প্রতি দয়া ও ক্ষমার উচ্চারণ প্রাধান্য পেতে থাকে, ক্রমশ পশ্চাৎপটে বিলীন হয় প্রাণোৎসর্গের নির্দেশাবলী।

এই একই প্রক্রিয়া এখনও হিন্দুধর্মে চলছে খিস্টধর্মের প্রভাবে। বৌদ্ধধর্মের উত্থানের সময় হিন্দুরা বৌদ্ধ প্রচারকদের শিক্ষাজনিত পরিবর্তনের জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। সেজন্যে বেদের নির্দেশে হোমযাগ ও অবাধ তামসিক নৈবেদ্যের পরিবর্তে ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রেম অনায়াসে ঠাঁই করে নিতে পেরেছিল। এরকম মিতাচার প্রথম দিকে নিঃসন্দেহে ইচ্ছানির্ভর। ক্রমশ তা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, অংশত মানুষের স্বাভাবিক দয়াশীল প্রবৃত্তির বশে, অংশত বৌদ্ধ প্রতিবেশীর অনুভূতির সম্মানে। একই ব্যাপার দেখা যায় বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে –সেখানে মুসলিমরা তাঁদের হিন্দু ভাইদের প্রতি সহমর্মিতায় গোমাংস পরিহার করেন। এজন্যেই জনসাধারণের রীতিনীতি ও আবেগকে বেদের মতোই অভ্রান্ত সত্য ঘোষণা করা ও বর্তমান যুগে বলি নিষিদ্ধ বলে প্রতিষ্ঠা করা শাস্ত্রকারদের পক্ষে সহজ হয়। একবার যখন তা করা সম্ভব হলো, তখন পরিবর্তনও হলো সম্পূর্ণ। এককথায় বৌদ্ধধর্মের মানবতার আবেদন অগ্রাহ্য করা স্মৃতির পক্ষে সম্ভব হলো না। আর এখন প্রাণীহত্যার বিভীষিকার বিরুদ্ধে আচারের বজ্র আঁটুনি এতটাই কঠিন হয়ে বসেছে যে বেদও তা কাটিয়ে উঠতে অপারগ।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১) ছিলেন এক বহুকর্মা পুরুষ। মূলত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হিসেবেই তাঁর পরিচয়। বহু প্রাচীন গ্রন্থ আধুনিক রীতিতে সম্পাদনা করে তিনি যশস্বী হয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বহু বিদ্যাসংস্থার সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' ও 'রহস্য-সন্দর্ভ' নামে দু'টি পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করতেন।

এখানে তাঁর 'Beaf in ancient India' প্রবন্ধটির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ সংকলন করা হলো।

টীকা

৫/৩২ শ্লোকটিতে বলা হয়েছে: "ক্রীত্বা স্বয়ং বাপ্যুৎপাদ্য পরোপকৃতমেবক। দেবান্ পিতৄংশ্চার্চ্চয়িত্বা খাদমাংসংন দূষ্যতি" এর অর্থ করা যেতে পারে- 'পশু মাংস ক্রয় করে,

শিকার করে অথবা পরের কাছ থেকে গ্রহণ করে যেভাবেই সংগ্রহ করা হোক না কেন তা দেবতা ও পিতৃগণের জন্য উৎসর্গ করবে। অবশিষ্ট মাংস ভক্ষণ করলে তাতে পাপ হয় না।' শ্লোকে কোন বিশেষ পশুমাংসের কথা বলা হয় নি। কাজেই সব ধরনের পশুমাংসই গ্রহণীয় বলে যে কেউ ধরে নিতে পারেন।

অন্যত্র একটি শ্লোকে মনু বলেছেন যে যজ্ঞার্থে মাংসভক্ষণ বৈধ, তবে শুধু শরীর পুষ্টির জন্য মাংসভক্ষণ অবৈধ না হলেও তামসিকভ্রমজাত (৫/৩১) বা রাক্ষসাচার (অর্থাৎ সাধারণ মানুষের আচার বহির্ভূত)।

কোন কোন ধরনের পশুমাংস ভক্ষণীয় তা মনু অন্য একটি শ্লোকে বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন (৫/১৮) :

"শ্ববিধং শল্যকং গোধাং খড়্গ-কুর্ম-শশাস্তথা।

ভক্ষ্যান পঞ্চিনখেষ্কাহুরেনুষ্ট্রাংশ্চৈকতো দতঃ।"

অর্থাৎ পঞ্চনখ বিশিষ্ট প্রাণী যেমন শৃগাল(?), সজারু, গোধা(গুইসাপ), গণ্ডার, কচ্ছপ ও খরগোশ এই ছয় জাতির প্রাণী ভোজন করা যায়; তাছাড়া একপাটি দন্তবিশিষ্ট পশুর মধ্যে উটের মাংস ছাড়া যজ্ঞে ভক্ষণ করা সিদ্ধ। এখানে শৃগাল নিয়ে কিছু প্রশ্ন রয়েছে। মূল শব্দটি হল "শ্বাবিধং প্রাণী", এর অর্থ অনেকে করেছেন শৃগাল। যেমন নীলকণ্ঠ প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ। আবার মনুসংহিতার টীকাকার কল্লুকভট্ট এর অর্থ করেছেন সেধ নামক জন্তু- অর্থাৎ সূক্ষ্মলোম বিশিষ্ট সজারু। তবে এ নিয়ে বিতর্ক আমাদের মূল প্রশ্নের সাথে প্রাসঙ্গিক নয়। মনুর নির্দেশ অনুযায়ী- একসারি দাঁতবিশিষ্ট পশুর মাংস ভক্ষণ করা বৈধ-অতএব গরুর মাংস ভক্ষণ যে বৈধ এ বিষয়ে স্পষ্ট কারণ গরু একসারি বিশিষ্ট প্রাণী।

গোমাংস ভক্ষণ যে বিশেষ করে যজ্ঞকালে, শাস্ত্রসিদ্ধ তার বিবরণ মনু অন্যত্র দিয়েছেন 'মধুপর্ক' অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে। 'মধুপর্ক' হল গোমাংসসহ 'মধুমিশ্রিত (এর সাথে দধি ও ঘৃতের মিশ্রণ) খাদ্য'।

মনু ৩/১১৯ ও ৩/১২০ শ্লোক দুটিতে বলেছেন- যার অর্থ হল: 'রাজা, পুরোহিত, স্নাতক, শিক্ষক বা গুরু এবং প্রিয় ব্যক্তি, শ্বশুর ও মাতুল- এঁরা বৎসারান্তে গৃহে এলে গৃহী 'মধুপর্ক' দিয়ে আপ্যায়ন করবে।

রাজা ও স্নাতক- এরা বৎসারান্তে শুধু যজ্ঞকর্মে উপস্থিত থাকলেই এঁদের মধুপর্ক দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হবে। তবে যজ্ঞ ভিন্ন অন্যসময়ে উপনীত হলে 'মধুপর্ক' না দিলেও চলে। (৩/১১৯-১২০)

সুতরাং গোমাংস ভক্ষণ মনুস্মৃতি মতে বৈধ ও আইনসিদ্ধ- এতে কোন অন্যায় বা পাপ হয় না।

-সম্পাদক